Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 166 – 177
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

বিভূতিভূষণের গল্পে ছোটোনাগপুরের ভূগোল : মানচিত্রবোধ ও অভিজ্ঞতার সূত্র

সৌরভ দাস
গবেষক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : sourav.nobitadas2@gmail.com

Keyword
ছোটোনাগপুর, বাঙালির সঙ্গে ছোটোনাগপুরের সম্পর্ক, বিভূতিভূষণের মানস জগত, ছোটোনাগপুরের গল্প, মানচিত্র, পরিসর, ভূগোল, জৈবিক ও মানসিক যোগ।

Abstract
বিভূতিভূষণের ভ্রমণকথা 'বনে পাহাড়ে' (১৯৪৫) এবং দিনলিপি 'হে অরণ্য কথা কও' (১৯৪৮) পড়লে দেখা যায় তিনি তাঁর জীবনের শেষ ৬-৭ বছর ঘুরে বেরিয়েছেন পাহাড়-জঙ্গল পরিবেষ্টিত ছোটোনাগপুর মালভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে। উক্ত বই দুটো ছাড়াও এ সময়ে সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র, বাণী রায় বা তাঁর স্ত্রীকে লেখা একাধিক চিঠিতে তিনি তাঁর ভ্রাম্যমাণ জীবনের একাধিক অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম সিংভূম, রাঁচি ও হাজারিবাগ ছিল তাঁর ভ্রমণের প্রধান ভূগোল। এ ছাড়া মানভূমের বাঘমুণ্ডি অঞ্চলেও তাঁর গতায়াত ছিল। পশ্চিম সিংভূমের সারান্ডা ও কোলহানের জঙ্গল, শঙ্খ-কোয়েল-ব্রাহ্মণী নদী অন্যদিকে পূর্ব সিংভূমের ঘাটশিলা, গালুডি, চাকুলিয়া অঞ্চল ভ্রমণকালে একাধিক অখ্যাত নদী, ড্যাম, বুরু বা ডুংরিতে ঘোরার কথা উঠে এসেছে তাঁর লেখায়। সেই সব ছোটো পাহাড়ের উচ্চতা, জঙ্গলের বর্গমাইলের পরিমাপ, উদ্ভিদের শ্রেণী নির্ণয়, শিলারূপের প্রকৃতি সম্পর্কে বহুবিধ তথ্য দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্যপ্রাণীর বিভীষিকা, ছোটো রাজাদের ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের কথাও বলেছেন ব্যাপ্ত পরিসরে।

এ সময়ে তাঁর কিছু ছোটো আখ্যানে চরিত্র বা কাহিনির পরিবর্তে ভূগোল বা সেটিং বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে; তাঁর জীবনদর্শনের কথা ভূগোলকে নির্ভর করেই প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি কোনো কোনো আখ্যানে কোনো চরিত্রই নেই - কেবল প্রকৃতি বা বিশেষ করে বললে ভৌগোলিক নানা পরিবর্তন ঘটনাকে রস সমৃদ্ধ করে তুলেছে। অনেক সমালোচক তাঁর দিনলিপি বা ভ্রমণকথাকে রসাভাস দুষ্ট বলে মনে করলেও এই আখ্যানগুলিকে কমবেশি সকলেই গল্পের মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু এই ধরণের আখ্যানে চেনা ছক পাওয়া যায় না। ভূগোল-নির্ভর বা স্পেসীয় টোম্পোরাল (Spatio Temporal) এই আখ্যানগুলোকে জিও-ক্রিটিসিজমের পদ্ধতিক্রমে আমরা আলোচনা করতে চাই।
এ ধরণের মোট আটটি গল্পের সন্ধান আমরা পেয়েছি, সেগুলি যথাক্রমে -

'অরণ্যে' (তালনবমী- ১৯৪৪)

'অরণ্যকাব্য' (ক্ষণভঙ্গুর- ১৯৪৫)
'কালচিতি' (জ্যোতিরিঙ্গন- ১৯৪৯)
'কুশল পাহাড়ী', 'জাল', 'মানতালাও', 'শিকারী' (কুশল পাহাড়ী- ১৯৫১)
'ছোটোনাগপুরের জঙ্গলে' (রূপ হলুদ- ১৯৫১)

এর মধ্যে 'অরণ্যে'র ভূগোল গালুডির কাছে রাখা মাইনসের জঙ্গল; অন্যগুলিও যথাক্রমে -

'অরণ্যকাব্য'- বাঘমুণ্ডি শৈলশ্রেণীর মাঠা অঞ্চল
'কালচিতি'- ডালমা পাহাড়ের কাছে সারোয়া পাহাড়
'কুশল পাহাড়ী'- মনোহরপুর
'জাল'- রামগড়
'মানতালাও'- হাজারিবাগ থেকে গয়া যাওয়ার রাস্তা
'শিকারী'- শঙ্খনদী-ব্রাহ্মণীর সংযোগক্ষেত্র
'ছোটোনাগপুরের জঙ্গলে' - চাইবাসার নিকটবর্তী গৈলকেরা

'অরণ্যকাব্য', 'জাল' বা 'মানতালাও' ব্যতিরেকে বাকি পাঁচটি আখ্যান সিংভূম অঞ্চল নির্ভর। আখ্যানগুলিকে কাহিনির প্রেক্ষিতেও তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন - কাহিনিহীন (অরণ্য, ছোটোনাগপুরের জঙ্গলে), কাহিনির আভাসযুক্ত (কালচিতি, কুশল পাহাড়ী, মানতালাও), কাহিনিধর্মী (অরণ্যকাব্য, জাল, শিকারী)। কাহিনি এখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জনসংস্কৃতিকে তুলে ধরতে চেয়েই বোনা হয়েছে। সেই সংস্কৃতিও ভূগোলনির্ভর। খাদ্যাভ্যাস, পেশা, পোশাক এ সবই জলবায়ু, ভূমিজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। সেই সঙ্গে ব্যক্তি চরিত্রের স্বভাব বা মানসিকতাও কতকাংশে নির্দিষ্ট ভূগোলজাত। এই বিষয়গুলিকে ধরতে চাওয়াই আখ্যানগুলির প্রধান লক্ষ্য। সেই সঙ্গে লেখক মনের অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা মিশে গেছে - কখনো রোমাঞ্চ, কখনো ভয়, কখনো মহাজাগতিক জীবনদর্শন।

ছোটোনাগপুর খনিজ সম্পদে পূর্ণ অঞ্চল। কোয়ার্টজাইট, নিস শিলার স্তর যেমন আছে তেমনই দামোদর বা সুবর্ণরেখার পলিমাটিও আছে। Physiography-র আলোচনা এই আখ্যানগুলির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সিংভূম অঞ্চল তামা, লোহা ও ম্যাঙ্গানিজ খনিজপূর্ণ। মাইনিং ফার্ম যেখানে বেশি সেখানকার জীবনযাত্রাও ফার্মগুলির দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত। আখ্যানগুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই বিভূতিভূষণ স্থাননামের হেরফের করেছেন - তা তাঁর এ সময়ে লেখা দিনলিপিগুলি (উৎকর্ণ, হে অরণ্য কথা কও) দেখলেই বোঝা যায়। ফলে মানচিত্রায়নের (mapping) ক্ষেত্রে যথার্থ স্থানটির অনুসন্ধান করা শ্রমসাধ্য। তবুও স্থান (place) নির্ণয়ে কোনো অসুবিধা নেই। আমরা মানচিত্রায়নের দ্বারা অঞ্চলগুলির Physiography, Geology, Mineral Beltsগুলি বোঝানোর চেষ্টা করবো। মৌলিকভাবে লেখক যে Space(পরিসর)-এর কথা বারবার করেছেন তার স্বরূপ নির্ণয় করাই আমাদের মূল কাজ হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লেখক দিনলিপিগুলি প্রকাশের সময় তারিখ উল্লেখ না করায় কিছু খামতি থেকেই যায়। কেননা দেখা যাবে অনেক আখ্যানের বীজ দিনলিপিগুলিতেই ছড়ানো আছে - সময়কালের উল্লেখ থাকলে ঋতু ধরে মিলিয়ে নেওয়া যেত বিভূতিভূষণের দেখা প্রকৃতির স্বরূপকে। যদিও অনেক আখ্যানেই লেখক ঋতু, এমনকি তিথিরও উল্লেখ করেছেন।

Discussion

প্রতিটি আখ্যানের নির্দিষ্ট সেটিং থাকে। সেখানেই আখ্যানের ভূগোল কেন্দ্রিক অবস্থানটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে প্রতিটি আখ্যানের ভৌগোলিক অবস্থানের উপরে নির্ভর করে চরিত্রের খাদ্যাভ্যাস, পোষাক, বাচনভঙ্গী, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। অনেক সময় ভৌগোলিক অবস্থানের উপরে নির্ভর করে কোনো আখ্যানের রসবস্তু বা ভাব। ভৌগোলিক অবস্থানের সৌন্দর্য আখ্যানেও সৌন্দর্যের ভিন্ন মাত্রা যোগ করতে পারে। এমনকি জীবনদর্শনের গভীর অর্থ প্রকটিত হয়ে ওঠে নির্দিষ্ট ভূগোলের প্রেক্ষিতে। এরকম ভাবেই বিভূতিভূষণের কিছু গল্পে ভূগোল নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে। ওই

নির্দিষ্ট ভূগোল না থাকলে গল্পটাই দাঁড়াতো না বলে মনে হয়। সেই গল্পগুলোকে আমরা ভৌগোলিক গল্প বলে চিহ্নিত করার পক্ষে।

ভৌগোলিক গল্পের ক্ষেত্রটিকে স্পষ্ট করার জন্য আমরা বিভূতিভূষণের ছোটনাগপুরের প্রেক্ষিতে রচিত গল্পগুলোকে নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী হয়েছি। কিন্তু গল্প আলোচনার আগে ছোটোনাগপুর অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে বাঙালির মূল সম্পর্ক নির্ণয়ের দিকে একটু চোখ ফেরাব। বাংলা অঞ্চলের অধিবাসীদের সম্পর্কে সবচেয়ে আদি নিদর্শন পাওয়া যায় ঐতরেয় আরণ্যকের একটি সূক্তে ("বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদান্যা অর্কন্তিতো বিমিশ্র ইতি" ২.১.১) — বঙ্গ-বগধ ও চের জাতিই যে এই অঞ্চলের আদিম জাতি সে কথা সেই সূক্ত থেকেই বোঝা যায়। এই 'চের' জাতি এখনও ছোটোনাগপুরের আদিবাসীদের পরিচয়, তারা নিজেদের চেরো বা চেরুও বলে থাকে। এই চের জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নিলে দেখব এদের মধ্যে দ্রাবিড়ীয় বৈশিষ্ট্য পুরোদস্তর বর্তমান। বাঙালি জাতির মধ্যেও কিন্তু দ্রাবিড়ীয় উপাদান মিশে আছে — সে সব বর্তমানে আত্মগোপন করে আছে ধর্ম ও সংস্কৃতির নানা ভাঁজে। ফলে ছোটোনাগপুরের আদিবাসীদের সঙ্গে বাংলা ও বাঙালির একটা যোগসূত্র প্রথম স্তর থেকেই বর্তমান।

বিভূতিভূষণের সঙ্গে ছোটোনাগপুরের যোগসূত্র খুঁজতে বিভূতিভূষণের মনসলোকে উঁকি দিতে হয়। তিনি আজন্ম বাস্তব জগতকে দেখেছেন কবিচোখের কল্পদৃষ্টিতে। তাঁর লেখালেখিই তার পরিচয় বহন করে। কিন্তু তার মানসের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য আসলে একটা বিশেষ কালের ফসল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইংরেজি শিক্ষা ও কৃষ্টির প্রতি একান্ত নিবিষ্ট বাঙালি মন উপলব্ধি করে সে শিক্ষার সীমাবদ্ধতা। বিশেষ করে যুব প্রজন্ম ভরসা হারাতে শুরু করেছিল। আর তার প্রতিফলনেই এ সময়ে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখালেখিতেও গ্রাম জগতের প্রতি টান ও কল্পনার ভাবুকতা মেশা সাহিত্য সৃষ্টির প্রতি অনুরাগ দেখা যাবে। বিভূতিভূষণ তার ব্যতিক্রম নন। সময়ে প্রেক্ষিতে বিভূতিভূষণের মানসলোকের পরিচয় দিতে গিয়ে বারিদবরণ চক্রবর্তী বলেছেন—

> "যুগগত জীবনযাপনের সর্বাঙ্গীন অসমতা- সামঞ্জস্যহীনতা অস্থিরতা -অনিশ্চয়তা ক্লেদকিন্ন পংকিলতা বিভূতিভূষণকে করে তুলেছিলো অনেকাংশেই বহির্মুখী। ঘটনা প্রবাহে সেই বহর্মুখিতার মধ্যেই এসে মিশেছিলো সাহিত্য সাধনার এবং ধর্মসাধনার ধারা। এই দ্বিবিধ সাধনার সিদ্ধিলাভের প্রয়াস পরবর্তীকালে বিভূতিভূষণের রক্ত-স্নায়ুতে দুরন্ত এক আবেগের সঞ্চার করে গেছে —ভারতেই নানা প্রদেশে, বিচিত্র অরণ্যাঞ্চলে তিনি সাধ্য অনুযায়ী পরিক্রমা করেছেন...।"[১]

এবং সে সূত্রেই দেখা যাবে, জীবনের শেষ কয়েক বছর বহুবার তিনি ছোটনাগপুরের অরণ্যে ঘুরে বেরিয়েছিলেন। সেই ভ্রমণের অভিযাত্রিকসত্ত্বাটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর 'বনে-পাহাড়ে' (১৯৪৫) নামক ভ্রমণ কথাটিতে এবং 'হে অরণ্য কথা কও' (১৯৪৮) নামক দিনলিপিধর্মী লেখাটিতে। ছোটনাগপুর মালভূমির অরণ্য পরিবেষ্টিত ভূগোলে তিনি বারবার ছুটে গেছেন কোন এক দুর্মর আকর্ষণে। সেই আকর্ষণের কথা বলতে গিয়ে তিনি বারবার spaceএর কথা বলেছেন— সে সূত্রেই অনন্ত শূন্যতা, নির্জনতার কথা; এ পরিবেশে তিনি নিবিড়ভাবে প্রকৃতিকে পেয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু তার সঙ্গেই সৌন্দর্যের কথা বলতে গিয়ে সাদা কোয়ার্জও কালো কোয়ার্জশিলার উপরে বিভিন্ন রঙের ফুলের কথা বলেছেন; ভূগোলের নিজস্ব সৌন্দর্য রঙের বৈচিত্র্যে, গন্ধের মগ্নতার, শিলার আকৃতিতে ধরা দিয়েছে তাঁর কাছে। অপরদিকে সৌন্দর্যমুগ্ধ বিভূতিভূষণ এ অঞ্চলের খাঁজে খাঁজে লুকিয়ে থাকা ভয় ও রহস্যের কথাও বলতে ভোলেননি—সিংভূমের জঙ্গলে লেপার্ড ও রয়েল বেঙ্গল জাতীয় বাঘ, হাতি, ভাল্লুক, সংখচূড়, পাইথন রয়েছে। এই সব শ্বাপদের হাতে পড়ে স্থানীয় মানুষ থেকে শুরু করে, বিভিন্ন মাইনিং ফার্মের লেবার পর্যন্ত কীভাবে মারা গেছেন তার সংক্ষেপ উল্লেখও করেছেন। এই সমস্ত বিচিত্র ভাববলয়ে দাঁড়িয়ে তিনি বারবার পৌঁছে গেছেন জীবনদর্শনের গভীরে। আরো বলেছেন,

> "ঋষিদের তপোবন এমনই নির্জন জায়গাতেই ছিল। ভারতের সভ্যতার জন্মস্থান এই বনানী, এইখানেই বেড়, উপনিষদ, বেদান্তের জন্ম হয়েছিল—হৈ হট্টগোলযুক্ত শহরের বুকে নয়।"[২]

অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্বরূপের খোঁজও তিনি পেয়েছেন এভাবেই। অরণ্যচারী মানুষদের স্বরূপ, তাদের লোকাচার, ধর্ম, বিশ্বাস, শিক্ষা, স্বভাব — নানা দিকের অনুসন্ধান করেছেন, পরিচয়ও দিয়েছেন।

যদিও বিভূতি-রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডের সম্পাদক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত 'বনে-পাহাড়ে' সম্পর্কে বলেছেন —

> "বিভূতিভূষণের সাতখানি ডায়েরি-গ্রন্থের মধ্যে 'বনে-পাহাড়ে' প্রকাশ-কালের দিক হইতে পঞ্চম। রচনার উৎকর্ষে বাকি ছয়খানির যে কোন একটি ইহা হইতে উৎকৃষ্ট। তবু বলি 'বনে-পাহাড়ে' বড় অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য-বস্তু নয়।"[৩]

আবার সপ্তম খণ্ডের ভূমিকায় পরিমল গোস্বামী বলেছেন,

> "বিভূতিবাবুর অরণ্য-পর্যায়ের লেখাতে অনেক জায়গাতেই দেখা যাবে চলতে চলতে গাছ-পালার সৌন্দর্যে তিনি অভিভূত হয়ে পথ চলা থামিয়ে দিয়েছেন। বসে পড়েছেন মাটিতে অনেক সময়। এই যে মূঢ় আনন্দ, এর কি কোনো ব্যাখ্যা আছে? মনটা যে কি বস্তু তাই তো জন যে না, এর মধ্যে কত জাতের কত তন্ত্রী। সৌন্দর্যের আঘাতে কারো সকল সৌন্দর্য-তন্ত্রী একসঙ্গে ঝণকৃত হয়ে ওঠে, কারো বা কম হয়, কারো বা কিছুই হয় না। এ নিয়ে তর্ক চলে না। নিসর্গ দৃশ্য যাঁদের মনে সাড়া জাগায়, তাঁর বিভূতিবাবুর অরণ্য-কথাগুলি পড়বেন।"[৪]

বিভূতিভূষণ পরিমলবাবুকে একবার বিক্রমপুর যাওয়ার সময়ে অরণ্য দেখে বলেও ছিলেন "পরিমলবাবু, ক্ষেপে যান, এ ছাড়া উপায় নেই।" তবুও বিভূতিভূষণ একাধিকবার তাঁর দিনলিপিতে বলেছেন তিনি বোধহয় উল্লেখ্য space বা space জাত ভাবকে ঠিক ভাবে বোঝাতে পারছেন না। সে ভাব বোঝাতে চাওয়ার প্রেরণা থেকেই লেখক আমাদের আলোচ্য গল্পগুলি লিখেছিলেন বলে আমাদের ধারণা। না হলে শেষ পাঁচ বছরেই ছোটনাগপুর মালীভূমি কেন্দ্রিক এতগুলি গল্প লিখবেন কেন?

ছোটনাগপুর-কেন্দ্রিক মোট আটটি গল্প নিয়ে এখানে আমরা আলোচনা করতে চাই। নিচে গল্পগুলি এবং পাশে গল্পগুলি যে যেগল্পগ্রন্থের অন্তর্গত তাদের নাম ও প্রকাশ কালের উল্লেখ করা হল –

'অরণ্যে' (তালনবমী, ১৯৪৪)
'অরণ্যকাব্য '(ক্ষণভঙ্গুর, ১৯৪৫)
'কালচিতি' (জ্যোতিরিঙ্গণ, ১৯৮৯)
'কুশল পাহাড়ী', 'জাল', 'মানতালও', 'শিকারী' (কুশল পাহাড়ী, ১৯৫১)
'ছোটনগপুরের জঙ্গলে' (রূপ হলুদ, ১৯৫১)

দেখা যাবে সমস্ত গল্পই জীবনের শেষ ছয়-সাত বছরেই লিখেছেন তিনি। গল্পগুলি বিচিত্র ভাবের, বিচিত্র ধরণের। ভাবের দিক থেকে গল্পগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায় –

১. অভিযান কাহিনী ('অরণ্যে', 'মানতালও')
২. দার্শনিক উপলব্ধির গল্প ('কুশল পাহাড়ী', 'ছোটনাগপুরের জঙ্গলে')
৩. অরণ্যচারী মানুষদের জীবনচর্যা ('কালচিতি', 'শিকারী')
৪. নাগরিক মানুষদের চোখে অরণ্য ('অরণ্যকাব্য', 'জাল')

এর মধ্যে কিছু গল্প কাহিনীহীন ('অরণ্য', 'ছোটনাগপুরের জঙ্গলে'), কিছু কাহিনীর আভাসযুক্ত ('কালচিতি', 'কুশল পাহাড়ী', 'মানতালও'), কিছু গল্প পুরোদস্তর কাহিনীধর্মী ('অরণ্যকাব্য', 'জাল', 'শিকারী')। গল্পগুলির রসবস্তু বা গঠনের টেকনিকের কথা আমাদের আলোচ্য নয়, আমাদের আলোচ্য গল্পগুলির ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট। তাই আমরা সর্বপ্রথমে গল্পগুলির মৌলিক স্থানটিকে নির্ণয় করে নিতে চাইবো। যথা —

'অরণ্য' : রাখা মাইনসের জঙ্গলের কাছে ধনঝরি পাহাড়।
'অরণ্যকাব্য' : বাঘমুন্ডী শৈলশ্রেণীর মাঠা অঞ্চল।

'কালচিতি' : ডালমা রেঞ্জের সরোয়া পাহাড়।
'কুশল পাহাড়ী' : মনোহরপুর।
'জাল' : রামগড়।
'মানতালাও' : হাজারিবাগ থেকে গয়া যাওয়ার রাস্তা।
'শিকারী' : শংঙ্খ ও ব্রাহ্মণী নদীর সংযোগ ক্ষেত্র।

'ছোটনাগপুরের জঙ্গলে' : সারাণ্ডা ফরেস্ট –

গল্পগুলির স্থান চিহ্নিত করলে দেখবো বিশেষভাবে কয়েকটি ভূগোল আখ্যানগুলিতে ফিরে ফিরে এসেছে। ছোটনাগপুর মালভূমির বিরাট অংশটাই যেহেতু বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মধ্যে পড়ে তাই ঝাড়খণ্ড রাজ্যের একটা মানচিত্র নিচে রেখে স্থানগুলিকে আপাতভাবে চিনে নিয়ে এগোবো।

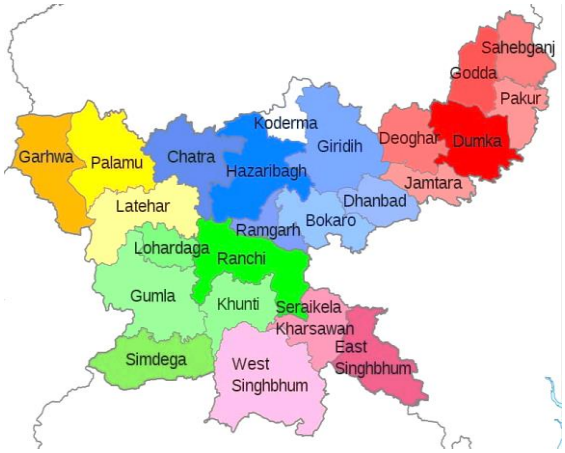

রাজ্যের জেলাগুলির ভিত্তিতে রাখা মাইনস পূর্বসিংভূমে, ডালমারেঞ্জ সেরাইকেলা খারসাওানে, মনোহরপুর পশ্চিম সিংভূমে, শঙংখ-ব্রাহ্মণী নদীর সংযোগ পশ্চিমসিংভূম, সারাণ্ডা ফরেস্টের একটা বড়ো অংশও সেরাইকেলা ও পশ্চিম সিংভূম জুড়ে; ফলে আমাদের আলোচ্য গল্পগুলির মধ্যে 'অরণ্যে', 'কালচিতি', 'কুশলপাহাড়ী', 'শিকারী' ও 'ছোটনাগপুরের জঙ্গলে' — এই পাঁচটি গল্প সিংভূম এবং সেরাইকেলার অংশ। বাকি তিনটির মধ্যে 'জাল' গল্পটি রামগড়ে, 'অরণ্যকাব্য' পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার মাঠা পাহাড়, যা মূলত রাঁচি জেলার পার্শ্ববর্তী এবং 'মানতালাও' হাজারিবাগে।

এর মধ্যে দেখা যাবে পূর্ব ও পশ্চিম সিংভূম-সেরাইকেলা অঞ্চলের গল্পইপাঁচটি। এই পাঁচটি গল্পই আমরা প্রথমে আলোচনা করবো। এই গল্পগুলিকে বিশেষভাবে আলাদা করে নিতে চাই কারণ physiography-র আলোচনায় দেখা যাবে এই অঞ্চলের প্রকৃতি একই। বিষয়টা বোঝানোর জন্য ছোটনাগপুরের physiographic একটি মানচিত্র এখানে তুলে দিলাম —

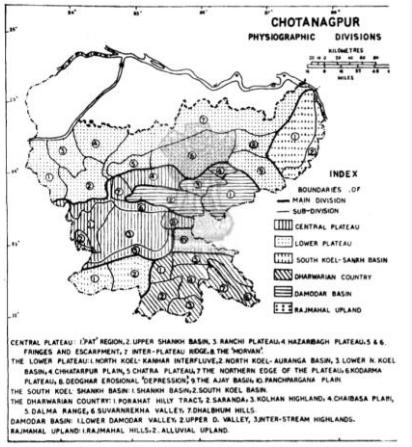

আমাদের পাঁচটি গল্পের ভূগোল dhorwariancountry এবং South Koyel-SankhBasin ভূমিবৃত্তেরমধ্যে পড়ে। 'CHOTONAGPUR : Geography of the rural settlement' নামক গ্রন্থে অযোধ্যা প্রসাদ উল্লেখিত ভূমিবৃত্তেরমধ্যে আরো উপবিভাগ করেছেন, যা যথার্থ অর্থেই ভৌগোলিক পরিবিভাজন। আমাদের আলোচ্য গল্পগুলির ক্ষেত্রে স্থানের কোনরকম রাজনৈতিক ভাগের থেকে ভৌগোলিক বিভাগটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু রাজনৈতিক ভাগ সবসময় প্রাকৃতিক ভূগোলকে মান্যতা দেয় না। কিন্তু আমরা আলোচ্য গল্পগুলিকে প্রাকৃতিক ভূগোলের ভিত্তিতেই ভৌগোলিক গল্পের সীমানায় রাখতে চাই। তাই ভূমিবৃত্তের উপবিভাগ ক্রমেই আমরা গল্পগুলিকেও আলোচনা করব। অযোধ্যা প্রসাদ নির্দেশিত DHARWARIANCOUNTRYর উপবিভাগগুলি হল –

১. Porahat Hilly Tract
২. Saranda
৩. KolhanHinghland
৪. Chaibasa Plain
৫. Dalma Range
৬. Suvarnarekha Valley
৭. Dhalbhum Hills[৫]

SOUTH KOYEL-SHANKH BASIN- কে আবার দুটি উপবিভাগে ভাগ করা হয়েছে--

১. ShankhaBasin
২. South koyel Basin

এর মধ্যে 'ছোটনাগপুরের জঙ্গলে' সারণ্ড, কোলহান, চাইবাসা অঞ্চলের আখ্যান; 'অরণ্যে'র পটভূমি সুবর্ণরেখা ভ্যালি এবং তার আশেপাশের ডালমা পাহাড়; 'কালচিতি' ডালমারেঞ্জের, 'কুশল পাহাড়ী' সারণ্ড এবং দক্ষিণ কোয়েল নদীর কাছাকাছি অঞ্চল এবং 'শিকারী'মূলত শঙ্খ নদীর পার্শ্ববর্তী মহাডাল পাহাড়।

এবার আলোচ্য পাঁচটি গল্পের বিষয়বস্তু আলোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করব ভূগোল কীভাবে গল্পগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

অরণ্যে – এটি একটি অভিযান কাহিনী। গল্পের কথক দোল পূর্ণিমার ছুটিতে গালুডি বেড়াতে গেছিলেন। সেখানে গিয়ে গালুডির মাইল পাঁচেক দূরে নিশিঝর্ণা নামের একটি ঝর্ণা ও তার পাশে অবস্থিত প্রাচীন এক দেউল দেখবার অভিপ্রায়ে একা একাগালুডি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। গালুডি ঝাড়খণ্ডের ডালমা রেঞ্জের মধ্যেকার একটি অঞ্চল। গালুডির দক্ষিণ-পশ্চিমে সুবর্ণরেখা। তার পারে সিদ্ধেশ্বর ডুংড়িও ধনঝরি শৈলমালা—উচ্চতা ১৫০০ ফুট। 'বনে-পাহাড়ে'তে বিভূতিভূষণ সিদ্ধেশ্বর ডুংড়িকে মোচাকৃতি বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন তা যেন ভিসুভিয়াসের মতো। উল্লেখ্য যে ডালমরেঞ্জ মূলত আগ্নেয় শিলা দ্বারা গঠিত। সিদ্ধেশ্বরডুংড়ি পেরিয়ে রাখা মাইনসের ভিতরে গালুডির পাকা রাস্তার সঙ্গে মুসাবনী রোড মিশেছে। সেখানে মাইনসের ভিতরের পাকা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে কথক ছোটো গ্রামের রাস্তা ধরেছেন। কুলামাড়ৌ নামক একটি গ্রাম পেরিয়ে তিনি ঝর্ণার খোঁজে ঢুকে যান গভীর অরণ্যের সুঁড়ি পথে। সেখানে তিনি গ্রামের পথ হারান।

যদিও কথক জানেন গ্রামের পথটি উত্তর-দক্ষিণ দিকে কোণ করে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গিয়ে আবার মুসাবনী রোডে পড়েছে। কিন্তু এ জঙ্গল শ্বাপদ সংকুল। দিনের আলোয় কথক বসন্তে ফোঁটা শাল-মঞ্জরীর সুবাসে মুগ্ধ হয়ে সেদিকে খেয়াল রাখেন নি। পথ খুঁজতে খুঁজতে সন্ধে হয়ে গেলে তিনি ধনঝরি পাহাড় টপকে মুসাবনী রোডে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পাহাড় টপকাতে গিয়ে তিনি একটি বড়ো 'রাগ' পাথর টপকান, যা এ দেশীয়রাও টপকাতে ভয় পায়; কেননা রাগে কোনো কিছু ধরার থাকে না, মসৃণ-চওড়া পাথর, পড়ে গেলেই মৃত্যু। আস্তে আস্তে সন্ধে নামে। কিন্তু

পাহাড়ের নিচের অরণ্য তখনো অন্ধকারাচ্ছন্ন। জঙ্গলে চাঁদের আলো পৌঁছোতে সময় লাগে। সেই জ্যোৎস্না দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেও বুঝতে পারেন শৈলসানু তখনো অনেক দূর। ফলে তিনি নামতে শুরু করলে রাগের কাছে পৌঁছে উল্টো না হয়ে চিত হয়ে নামতে গিয়ে প্রায় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। সেই রাগ ছিল ২০/২২ হাত দীর্ঘ এবং ৩০/৩২ হাত প্রস্থযুক্ত। কোনো রকমে নামতে পারলে শেষে নদীর জল মাথায় দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গ্রামের রাস্তাটা ঠিকই খুঁজে পান এবং কুলামাড়ৌ গ্রামে পৌঁছান। স্থানীয়রা কথককে বলেন ও অঞ্চলে শঙ্খচূড়ের প্রচণ্ড ভয়, তাদের ভাষায়—

> "খুব বেঁচে গিয়েছিস বাবু। শাঙ্খচূড় সাপের সামনে পড়লে আর বাঁচাতিস না। ধনঝরির বনে বড্ড শঙ্খচূড় সাপের ভয়।"[৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কথক চাইলেই কোনো লোকাল গাইড সঙ্গে রাখতে পারতেন, তিনি রাখেননি কেবল একা একা জঙ্গলে নিজের মতো ঘুরতে চান বলেই।

এ গল্প লেখকের অভিজ্ঞতানির্ভর। সম্পূর্ণত না হলেও দু-একটা খণ্ড অভিজ্ঞতার নিরিখেই রচিত। 'বনে-পাহাড়ে'তে এ রকম ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, যেখানে লেখক এক পাহাড়ে শঙ্খচূড়ের হাত থেকে রক্ষা পান; সে ক্ষেত্রেও সন্ধে হয়ে গেলেও কেবল অরণ্যের মুগ্ধতায় বসে থেকেছেন। সেখানেও গ্রামবাসীরা তাঁকে বলেছিলেন –

> "সন্দেবেলা ও-পাহাড়ে কেউ যায়? দেখতে পাননি গরু চড়ে না ও-পাহাড়ে। যে পাহাড়ে গরু চড়ে না সে পাহাড়ে বিপদ আছে বুঝতে হবে।"[৭]

ওই গ্রামের নাম চন্দ্ররেখা, পাহাড়ের নাম উলদাডুংড়ি, সেটিও ছিল ঘাটশিলার কাছাকাছি কোনো পাহাড়। আবার সিদ্ধেশ্বরডুংড়িতেও তিনি শঙ্খচূড় সাপের খোলস দেখেছিলেন এরকমই ঝর্ণা দেখতে গিয়ে। ফলে জায়গার নাম বদলে দিয়ে, বিচিত্র ঘটনাকে-অভিজ্ঞতাকে একত্রিত করে তিনি এ গল্প লিখেছিলেন বোঝা যায়। এই গল্পে পাহাড়ের উপর থেকে দেখা নিচের জঙ্গলের যে চিত্রকল্প লেখকের কাছে কাফ্রিদের মাথার চুলের মতো কালো অন্ধকার বলে মনে হয়েছিল তাও কিন্তু একটি অভিজ্ঞতালব্ধ। এই গল্পে যেমন পূর্ণিমার সন্ধের উল্লেখ আছে অনুরূপ উল্লেখ আছে 'থলকো বাদে একরাত্রি' নামক চিঠিটিতে, যেটি তিনি লিখেছিলেন বনগ্রাম নিবাসী শ্রী মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়কে। থলকোবাদ ভ্রমণকালে তাঁর সঙ্গী মিঃ গুপ্ত (রাসবিহারী গুপ্ত) তাঁকে বলেছিলেন,

> "যদিও পূর্ণিমা কিন্তু এ বনে চতুর্দিকের শৈলমালা ভেদ করে চাঁদের আলো পড়তে এক ঘন্টা দেরি হয়ে যাবে।"[৮]

ফলে বোঝাই যায় তাঁর এ চিত্রকল্পও একটা নির্দিষ্ট ভূগোল নির্ভর। শুধু সামান্য কল্পনার মিশেলে তিনি 'অরণ্যে' গল্পটিকে খাড়া করেছেন। এ রকম আরো ঘটনার উল্লেখ তাঁর আরো কিছু চিঠিতেও আছে।

ফলে বোঝাই যায়, নির্দিষ্ট ভূগোলটি না থাকলে এ গল্পের জন্মই হত না। ভূগোলই এ গল্পের প্রাণ। ঘটনা সংস্থানও ভূগোল-নির্ভর। লীলা মজুমদার গল্পটি সম্পর্কে বলেছিলেন—

> "আখ্যান কিছু নেই, রাখা মাইন্সের কাছে ঘোর জঙ্গলে পাহাড়ে নদীর ধারের বিপদ-সংকুল স্থানে পায়ে হেঁটে ভ্রমণ। পড়ে মনে হয় বিভূতিভূষণের স্মৃতিরেখা থেকে ভেঙ্গে আনা টুকরো, রসে ভরপুর, ভাবে গম্ভীর।"[৯]

তিনি কিছুমাত্র ভুল বলেননি তাই প্রমাণ হল।

যেহেতু ভূগোল ছাড়া এ গল্প দাঁড়ায় না, তাই এ অঞ্চলের ভূগোলের দিকে তাকাতেই হয়। ডালমা রেঞ্জের ভূমিবৃত্ত হল—

> "The eastern section consists of the highest peak of the range, the Dalma which rises 3,407ft. above sea level and 2,500 ft. above the adjacent valley of the Suvarnarekha."[১০]

ফলে পাহাড়ের উচ্চতা সম্পর্কে গল্পে যা বলা হয়েছে তা সঠিক। এছাড়াও যে 'রাগ' নিয়ে পুরো গল্পের মূল রোমাঞ্চ তৈরি হয়েছে তার সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়—

> "The hill sides have precipitous slopes averaging 30digree, but at places, exceeding 45dgree. Along the inter-ridge longitudinal valleys, the slope is reduced from 5dgree to 3dgree. All these slopes are difficult to ascend and have effectively resisted human occupance, except in scattered patches of river valleys in the foot-hill zones."[১১]

এ অঞ্চল তামা খনিজের জন্য বিখ্যাত, তামা খনি ছিল রাখা মাইনসে। গল্পেও 'তামা পাহাড়ে'র উল্লেখ আছে। ছোটনাগপুর খনিজসমৃদ্ধ অঞ্চল, কোন অঞ্চলে কী খনিজ আছে তা বোঝানোর জন্য নিচে একটি চিত্র দেওয়া হল—

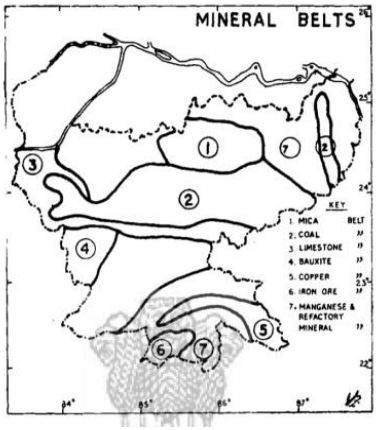

কালচিতি – ডালমা রেঞ্জেরই আশেপাশের স্থান নিয়ে লেখা হয়েছে এই গল্পটি। বিষয়ের দিক থেকে এটি অরণ্যচারী মানুষদের জীবননির্ভর গল্প, গঠনের দিক থেকে এটি একটি কাহিনীধর্মী গল্প। এ গল্পের যেটুকু রসবস্তু তা ঐ নির্দিষ্ট ভূগোলের বাসিন্দাদের সংস্কৃতি, লোকাচার, সংগ্রামের উপরেই দাঁড়িয়ে। ফলে এ ক্ষেত্রেও ভূগোলটিকে না জানলে গল্পটিই সম্পূর্ণ বোঝা যায় না।

'**কালচিতি**' একটি গ্রামের নাম। কথকের জবানে তা যেন 'রূপকথার গাঁ'। কথক বলেছেন,

> "শহর থেকে অনেক দূরে, পাহাড়ী বনের ধারে, শাল আসান মহুল গাছের ছায়ায় লুকানো আছে রূপকথার গ্রাম। জ্যোৎস্নারাত্রে বনের ফুলের সুবাসে এদের কুটিরের বাতাস মদির করে তোলে, বাঘ-ভালুক উঁকি মারে আনাচে কানাচে, বনের ময়ূর নৃত্য করে এমনি বর্ষার দিনে কুসুম-গাছের ডালে; খুব নিস্তব্ধ, শান্তি ও নির্জ্জনতায় বভরা দিনে এরা গান গেয়ে বেড়ায় গ্রামের মাঠে পথে।"[১২]

এ গ্রাম কথকের বাসস্থান থেকে ১০ মাইল দূরে, অর্থাৎ শহর থেকে দূরে। ডিবু ডুংরি এবং সারোয়া পাহাড় পেরিয়ে কালচিতি পৌঁছতে হয়। 'ডুংরি' ছোট টিলা—তাই সেটা পেরোনো নিয়ে কথা না বলে কথক সারোয়া পাহাড় পেরোনো যে শ্রমসাধ্য সে কথা জোড় দিয়ে বলেছেন। এই যাত্রাপথের বর্ণনায় তিনি উল্লেখ করেছেন বহু গাছ, নদীর ধারের লতা, ফুলের কথা। সে সঙ্গেই শহরের সঙ্গে যোগাযোগ কম বলে 'ব্ল্যাকমার্কেটের' এখানে নেই, নেই মানুষের সঙ্গে মানুষের বিবাদ। সময়টা বর্ষার শেষের দিকের, ফলে মাঠে ধান পেকেছে, হাতিরা ধান খেতে আসে সন্ধে নামলে। দিনে দুপুরে ভালুক বোনঝোপে লুকিয়ে থাকে— গরুকে জল খাওয়াতে গাড়োয়ান তাই সঠিক স্থানটি বেছে নেয়; কথকের কাছে সেটা একটা অভিজ্ঞতার অংশ, স্থানীয়রা জানে কোথায় কী থাকে। এই নির্জ্জনতা, সৌন্দর্যের সঙ্গেই কথক আবিষ্কার করেছেন এক ঐতিহাসিক সত্য — খৃস্টান ধর্ম এ সব অঞ্চলের জীবনকে নানাভাবে সভ্য করে তুলেছে, তাদের পোষাক, রুচি, আদর্শবোধকে গড়ে তুলেছে। ভুলে গেলে চলবে না, এ গল্প স্বাধীনতা সমসাময়িক—ফলে ঔপনিবেশিক ভারত এবং স্বাধীন ভারতের মাঝে দঁড়িয়ে আদিবাসী শিশুদের মুখে 'জয় হিন্দ' ধ্বনী গোটা ভারতের রূপকে স্পষ্ট করে তুলেছে; সেই সঙ্গে ঔপনিবেশিক ভারতের অবদানের কথা বলতেও ভোলেননি লেখক। হো উপজাতির বাস এ অঞ্চলে, হো মেয়েদের নামের শেষে 'কুই' ব্যবহৃত হয় — এই তথ্যটিও ভ্রমণের অঙ্গ। গল্পে কথককে সৌজন্য-বিনিময়বাবদ গ্রাম

প্রধান যে উপহার দেয়, তাও ভূগোল নিঃসৃত সংস্কৃতির পরিচায়ক। এই গল্পটিও আদতে ভ্রমণধর্মী। ভ্রমণকথায় ভূগোলকে জানতে চাওয়াই প্রধান। সেদিক থেকে এ গল্পও ভৌগোলিক হয়ে উঠেছে। তাছাড়া ভূগোলই এই গল্পে সৌন্দর্য চেতনা জুগিয়েছে, যা গল্পের মূল রসবস্তু।

'অরণ্যে' গল্পের মতো 'কালচিতি'ও লেখকের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। 'হে অরণ্য কথা কও'এ রাসবিহারী গুপ্তের সঙ্গে থলকোবাদ ভ্রমণকালেস্থানীয় কিছু হো পুরুষদের দেখে বিভূতিভূষণের মনে হয়েছিল—

> "এই দরিদ্র সরল লোকগুলিই ভারতবর্ষের প্রাণবন্ত। অথচ কি দুঃখপূর্ণ জীবন এদের!"[১৩]

সারেন্ডার জঙ্গলে গাংপুর স্টেট ভ্রমণকালে বিটকেলসোয়া গ্রামে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন হো আদিবাসিদের বিরাট অংশই খৃস্টান। খবর নিলে ফরেস্টার খুন্টিয়া বলেছিলেন—

> "পালকোটের রাজা এক সময়ে হো-দের ওপর বড্ড অত্যাচার করে। তখন এরা খ্রীস্টান হয়। মিশনারীদের প্ররোচনায়।"[১৪]

এখানেই তিনি জানতে পেরেছিলেন হো মেয়েদের নামের শেষে 'কুই' ব্যবহৃত হয়। যে কোনো ভূগোলের নির্দিষ্ট ইতিহাস থাকে, সেই ইতিহাস নানাভাবে স্থানীয় জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে, তাই বহন করতে হয় বহুদিন অবধি — এ সত্যও আবিষ্কার করা যায় এই ঘটনা থেকে।

'কালচিতি' গল্পে 'টেঁড়াপানি' নামের একটি সাঁওতাল গ্রামের উল্লেখ আছে। যার অর্থ যে জায়গা থেকে জল দূরে থাকে। ডালমা রেঞ্জ মূলত আগ্নেও শিলা দ্বারা গঠিত— এখানে গ্রানাইট এবং তার রূপান্তরিত রূপ নিস শিলার আধিক্য, যা অ-স্তরীভূত। পাললিক শিলা থেকে যেমন সহজেই ভূ-গর্ভস্থ জল বেরিয়ে আসতে পারে আগ্নেয় শিলা থেকে তেমন পারে না, তাই জলকষ্টের একটা গ্রাম নাম দিয়েই নিজেদের পরিচিত করতে চায় যেন। আবার গল্পে ডিবুডুংরি পেরিয়ে অনেকটা পরে গিয়ে গাড়োয়ান গরুকে জল খাওয়াবে বলেছে— এ তথ্যও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। যদিও মনে রাখতে হবে এ গল্প বর্ষার গল্প।

পূর্ব সিংভূমের এবং সেরাইকেলার গল্প শেষ করে এবার আমরা পশ্চিম সিংভূমের গল্পের দিকে এগোব।

ছোটনাগপুরের জঙ্গলে - গল্পটিতে আখ্যানের লেশমাত্র নেই বললেই চলে। এটি একটি অভিযানধর্মী গল্পের সীমার মধ্যে পড়লেও সুকুমার সেন গল্পটিকে 'একটি রচনা, গল্প নয়'[১৫] বলেছেন। সত্যিই গল্পটি পড়লে মনে হয় এটি যেন তাঁর দিনলিপির ছেঁড়া পাতা। তবুও নিবিড় দার্শনিক উপলব্ধির জন্য গল্পটি দিনলিপির চকিত প্রকাশ থেকে অনেক বেশি সংবদ্ধ হয়েছে। তাই বোধহয় তিনি গল্পটিকে গল্পের মর্যাদাই দিয়েছেন।

এ গল্পের কথক চাঁইবাসা হয়ে মূলত সারেন্ডার জঙ্গলেই ঘুরে বেরিয়েছেন। গল্পে বাকৈলা, গৈলকেরা, খাজুরিয়া প্রভৃতি জায়গার নাম উঠে এসেছে; উঠে এসেছে কুরো, সঞ্জয়, কোইনা প্রভৃতি নদীর নামও। কথক দুপুরের, সন্ধের, রাতের নানা রূপে জঙ্গলের দর্শন করে ভগবানের কাছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন এবং পুত্রস্নেহবশে ভগবানের কাছে প্রারর্তথনা করেছেন তাঁর ছেলে বাবলু যেন ভগবানের এ সৃষ্টির স্বাদ নিতে পারে। গল্পে মোট পাঁচবার তিনি ভগবানের কথা বলেছেন।

এ গল্পের কথাবস্তুর সংঙ্গে 'বনে-পাহাড়ে' এবং 'হে অরণ্য কথা কও' পড়লেই মিল পাওয়া যাবে। সারেন্ডা ভ্রমণের বহু ঘটনার কথাই সেখানে লিপিবদ্ধ। তাছাড়া গল্পে মূল ঘটনা না থাকায় গল্পটির সঙ্গে কোনো অভিজ্ঞতার মিল না খুঁজে আমরা সরাসরি এ অঞ্চলের ভূগোলের দিকে নজরপাত করি। যদিও তাঁর স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে সান্ধ্যকালে ডুংরির উপরে উঠে চিঠি লেখার অভ্যেসের সঙ্গে এ গল্পের একটি ঘটনা মিল পাওয়া যায়।

সারেন্ডাকে বলা হয় সাতশো পাহাড়ের দেশ। এর উপত্যকা অঞ্চল সঞ্জয় এবং দক্ষিণ-কোয়েল নদী দ্বারা গঠিত। এই অঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল—

> "The landscape has been sculptured out of the Dharwarian rocks grouped under the name of Iron-ore series. The Iron-ore series consisting of phylite, tuf, lava, quartzite and limestone, exhibit a broad spectrum of metamorphism that has made the rocks vary within a very wide range of hardness and resistance to erosion."[১৬]

এ প্রসঙ্গেই বলার গল্পেও লেখক এ অঞ্চলের পাহাড়কে 'লৌহপ্রস্তর' বলে উল্লেখ করেছেন। ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে অর্থাৎ শীতকালের প্রেক্ষিতে লেখা এ গল্প; ফলে শীতের বিকেল তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাওয়ায় ডুংড়ির উপরে সূর্যাস্তের রূপ দেখে কথকের চিঠি লেখার ঘটনাটিও ভূগোলের সীমানায় বিচার্য।

কুশল পাহাড়ী – বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির একটি এই গল্প। এটিও একটি দার্শনিক উপলব্ধির গল্প। ভাদ্রের শেষে মনোহরপুরের সুন্দরগড় স্টেটে এক সাধুজীর আশ্রমে বেড়াতে গিয়ে সাধুজীর মুখে দ্বৈত-অদ্বৈত নির্ভেদে ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝে নেওয়াই এ গল্পের মূল রসবস্তু। আগেই বলেছি ছোটনাগপুরের অরণ্য দেখে লেখক বারবার প্রাচীন ভারতের তপোবনের কথা বলেছেন। এ গল্পেও সাধুজীর আশ্রম সেই তপোবনেরই দ্যোতক। যে সাধু বলেন—

> "কবিই তিনি বটেন বাবা। এখানে বসে বসে দেখছি। এই শালগাছটাতে ফুল ফোটে, বর্ষাকালে পাহাড়ে ময়ূর ডাকে, ঝর্ণাদিয়ে জল বয়ে যায়, তকখন ভাবি, কবিই বটে তিনি।"[১৭]

এই বোধ তো ভূগোলজাতই।

'হে অরণ্য কথা কও'এ মনোহরপুরের কাছে পাঞ্চেমগুটু পাহাড়ে নৃসিংহ দাস সাধুজীর আশ্রমের উল্লেখ করেছেন লেখক। শুধু পাহাড়ের নাম বদলে তিনি কুশল পাহাড়ী করে দিয়েছেন। তাছাড়া বহরাগড়া ঘোরার সময় এক সন্ন্যাসীর ভাঙা আশ্রমের কথাও বলেছিলেন, বা 'বনে-পাহাড়ে'তে তিনি ঝাড়গ্রামের কাছেও এক সাধুজীর আশ্রম পেয়েছিলেন— যিনি সংসার ত্যাগ করেও বৈষয়িক। কিন্তু লেখক এ সব আশ্রমের ভুলত্রুটির উর্দ্ধে এক বিশেষ দর্শনকে আরোপ করেছেন—যা আসলে তাঁরই নিজস্ব।

এ গল্পেও পরিসরের কথা বলতে গিয়ে লেখক ভিসুভিয়াসের মোচাকৃতি শিখরদেশের কথা, নিস পাথরের কথা বলেছেন। এ অঞ্চলের একটি বিশেষ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হল—

> "The hill-tops made of banded-hematite-quartzite dipping at greater angle have been weathered and spiit-up into vertical columns which impart unique appearance to the Dharwarian tract."[১৮]

ফলে বোঝাই যায় ঠিক কী ধরণের পরিসরের কথা লেখক এখানে বলতে চেয়েছেন।

শিকারী – এটি একটি কাহিনীধর্মী গল্প। অরণ্যচারী মানুষের জীবন সংগ্রাম এই গল্পের মূল বিষয়বস্তু। তাদের সরল জীবনের সহজ আবেগ গল্পটির রসবস্তু ধরে রেখেছে। মহাডাল পাহাড় ও চুকুরদি ফরেস্টের মাঝে অবস্থিত বনকাঠি নামক গ্রামের মাগনিরাম এই গল্পের মূল চরিত্র। বর্ষায় হাতি ধান খেতে নামলে তাকে হত্যা করে প্রাণ দেয় সে। মাগনিরাম আসলে তার বাবার মতো পরিচিত হতে চেয়েই এই কাজটা করে—যা ওই ভূগোলের মানুষের আবেগ বুঝেই লেখা। কোনো মৌলিক ঘটনা এই গল্পকে উস্কে দিয়েছিল কিনা জানা নেই—লেকখক কোথাও বলেননি।

বাকি তিনটি গল্পের মধ্যে 'মানতালাও' অভিযান কাহিনী; গয়া অঞ্চলের রুক্ষ প্রকৃতির মধ্যে শ্যামল বৈচিত্র্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন কথক। 'অরণ্যকাব্য' মাঠা অঞ্চলের একটি বনবাংলোর বাঙালী কেয়ারটেকারের মৃত্যুতে পরিজনহীন অরণ্যপ্রবাসী তাঁর স্ত্রীর জীবনের কথা; ১৫/৩/৪৩ সালে রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে মাঠার প্রকৃতির কথা বলেছিলেন—যার সঙ্গে এ গল্পের মিল অনেকাংশে। 'জাল' সম্পূর্ণ কাল্পনিক গল্প— যদিও অরণ্যের নির্জনতার শহুরে মানুষের হাঁফিয়ে ওঠার কথা এখানেও আছে। উপরের গল্পগুলির ধরণে এগুলি বিচার করলেও দেখা যাবে গল্পগুলি ভৌগোলিকতা একই মাত্রায় নির্ণয়যোগ্য, তাই এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল না।

আখ্যানের নির্দিষ্ট ভূগোলের কথা বলার মৌলিক সমস্যা হল— বাস্তবের ভূগোল এবং গল্পের ভূগোল নাও মিলতে পারে। কেননা গল্প সব সময়ই কাল্পনিক। রসই সাহিত্যের প্রাণ। এ গল্পগুলিও লেখক তাঁর অভিজ্ঞতাকে প্রাণ দিতে চেয়েই লিখেছেন। তবু ভ্রমণ নির্ভর আলোচ্য গল্পগুলিকে ভৌগোলিক গল্প বলা যায়, যেহেতু ভূগোল ছাড়া গল্পগুলি দাঁড়ায় না।

তথ্যসূত্র :

১. চক্রবর্তী, বারিদবরণ, বাংলা কথাসাহিত্যে বিহারের লোকজীবন, জুলাই ১৯৯১, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, পৃ. ১৬৮
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, বিভূতি-রচনাবলী পঞ্চম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৩২
৩. ওই, ভূমিকা
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, বিভূতি-রচনাবলী সপ্তম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৬ মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স, কলকাতা, পৃ. ভূমিকা
৫. PROSAD, AYODHYA, CHOTONAGPUR: Geography of rural settlements, 1973, RANCHI UNIVERSITY, Ranchi p. 13
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, বিভূতি-রচনাবলী নবম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ তৃতীয় মুদ্রণ, ১৩৮৫, মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স, কলকাতা, পৃ. ২৫৯
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, বিভূতি-রচনাবলী পঞ্চম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৪৬৭
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, বিভূতি-রচনাবলী পঞ্চম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স, কলকাতা পৃ. ৪৭৪
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, বিভূতি-রচনাবলী নবম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৩৮৫, মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স, কলকাতা, ভূমিকা
১০. PROSAD, AYODHYA, CHOTONAGPUR: Geography of rural settlements, 1973, RANCHI UNIVERSITY, Ranchi, p. 24
১১. PROSAD, AYODHYA, CHOTONAGPUR: Geography of rural settlements, 1973, RANCHI UNIVERSITY, Ranchi, p. 24-25
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, বিভূতি-রচনাবলীএকাদশ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৯২, মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৩০০
১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, বিভূতি-রচনাবলীসপ্তম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৩, মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৪১৭
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, বিভূতি-রচনাবলীসপ্তম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৩, মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৪৩০
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, বিভূতি-রচনাবলীচতুর্থ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৩৮৫, মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স, কলকাতা, ভূমিকা
১৬. PROSAD, AYODHYA, CHOTONAGPUR: Geography of rural settlements, 1973, RANCHI UNIVERSITY, Ranchi, p. 23
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, বিভূতি-রচনাবলী একাদশ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৯২, মিত্র ও

ঘোষ পাব্‌লিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৩২১

১৮. PROSAD, AYODHYA, CHOTONAGPUR: Geography of rural settlements, 1973, RANCHI UNIVERSITY, Ranchi, p. 23

সহায়ক বাংলা গ্রন্থ :

১. গোস্বামী, পরিমল, পথে পথে, ১৩৬২, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা
২. চক্রবর্তী, বারিদবরণ, বাংলা কথাসাহিত্যে বিহারের লোকজীবন, জুলাই ১৯৯১, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, বিভূতি-রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ ১৩৯৪, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, বিভূতি-রচনাবলী ৭ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, বিভূতি-রচনাবলী ৯ম খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ ১৩৮৫, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, বিভূতি-রচনাবলী ১১শ খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ ১৩৯2, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ :

১. PRASAD AYODHYA, CHOTONAGPUR Geography of rural settlement, Ranchi University, 1977, Ranchi.
২. এখানে ব্যবহৃত মানচিত্র অযোধ্যা প্রাসাদের বই থেকে নেওয়া।